কিংবদন্তীরদীঘি-পুষ্করিণী

বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

সাবেককালে গাঁয়ে-গঞ্জে এখনকার মতঢালাও নলকূপের চলন ছিল না। শহরেওছিল না এমন ঘরে ঘরে কলের জলের ব্যবস্থা। কাছেপিঠে প্রকৃতির দেওয়া নদীনালা থাকলে সাধারণত সেগুলিই হয়ে উঠত জল সংগ্রহের অন্যতমউৎস। নচেৎরাজা-রাজড়া-জমিদারবাবুদের কাটা দীঘি-পুষ্করিণীগুলিই হত ভরসা।

জল না খেয়ে কেউ বাঁচে না। তাইজলের আরেক নাম জীবন। বেঁচে থাকার তাগিদেই, যেসব জায়গায় নদীনালা নেই,সেখানকার মানুষকে আসতে হত এইসব দীঘি-পুষ্করিণীতে।

দীঘি-পুষ্করিণী থেকে জল সংগ্রহেরকাজটা মূলত করত মেয়েরাই। পুযেরা বাইরের কাজ করত বলে যখন খুশিঅন্যের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের অবকাশ পেত।মেয়েদের কিন্তু সে-সুযোগ ছিল না । তাদের বাইরে বেবার একটা জ ায়গাই ছিলএবং সেটি জল আনার ছলে এই দীঘি পুষ্করিণীতে আসা। এই দীঘি-পুষ্করিণীরঘাটে বসে তারা দু-দণ্ড পড়শিনীদের সঙ্গে মনের কথা কইতে পারত। আগেকারদিনে রাজা-জমিদারবাবুরা 'কেবল মহিলাদের জন্য' নামে এক ধরনেরদীঘি-পুকুর সংরক্ষিত করে রাখতেন। সেইসব দীঘি-পুষ্করিণীর পাড়উঁচু মাটির পাঁচিলদিয়ে ঘেরা থাকত। সেখানে মেয়েরা পরস্পরএকান্ত গোপন কথাও বিনিময় করতে পারত নিরিবিলিতে এবং নির্ভয়ে।

বাংলার প্রণয়মূলক গাথাসাহিত্য'মৈমনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য় এইসব জলাশয় নিছক-দীঘি-পুষ্করিণীই নয়, গীতিকাগুলির অন্যতম চরিত্রও বটে। প্রসঙ্গতউল্লেখযোগ্য সেইসব দীঘি-পুষ্করিণী ছিল না ছিক কবি-কল্পনা, ব াস্তবঅস্তিত্বসহ তাদের ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। বস্তুত ঐসব ঐতিহাসিকদীঘি-পুষ্করিণীকে ঘিরে গড়ে-ওঠা কিংবদন্তিগুলিকে আশ্রয় করেইরচিত হয়েছিল গীতিকার ঐসব কাহিনী। সোনাই দীঘি, বাঘড়ার হাওড়, বইদ্যারবিল- অ ার কত নাম করব ! কত মধুরস্মৃতি জড়িয়ে আছে এইসব দীঘি-পুষ্করিণীর ঘাটে ঘাটে। চন্দ্রাবতী-জয়ানন্দেরপ্রণয়-প্রস্তুতি শু হয়েছিল তো ভোরবেলাকার পুকুরপাড়েপুষ্পোদ্যানে, আবার মলুয়া-বিনোদের প্রথম দেখাও সাঁঝেরবেলায়কদমতলায়, সেই পুকুরপাড়েই! অবশ্য বিপরীত চিত্রেরও অভাব নেই। সোনাই দীঘি তো শোকের দীঘিই।

রংপুরে মহীপালের দীঘিকে কেন্দ্রকরেও এক বিষাদগাথা রচিত হয়েছিল 'মহীপালের গীত' নামে যা অংশতস্থান পেয়েছে 'পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য়। গাথাটি যে -পর্যন্ত উদ্ধার করা হয়েছে তার কাহিনীমোটামুটি এ-রকম ঃ

নারীলোলুপ অত্যাচারী রাজামহীপাল ছিলেন প্রজাদের চক্ষুশূল। কিন্তু ভয়ে কেউ প্রতিবাদকরত না । মা-বাবার নিষেধ অমান্য করে মহীপালের দীঘিতে স্নানে গেল সুন্দরীযুবতী লীলা।

লীলার স্নানের বর্ণনাঃ

হাটু পানিতে নাম্যারে লীলা হাটুমাঞ্জন করে ।
মাজা পানিতে নাম্যারে লীলা গাও মাঞ্জনকরে ।।

'খববিয়া'- মারফৎ খবর পেয়ে মহীপাল স্বয়ং দীঘিতে নেমে স্নানরতা লীলার চুল ধরে টানমারে। লীলা তখন এই বলে কঁ াদতে থাকে ঃ

কে ধরিল কে ধরিল আমার চুলের দুখেমল্যাম
বাপের মানা না শুইন্যা আমি দীঘেরঘাটে আইলাম।।
কলঙ্কিনী লীলা গো আমিকলঙ্কিনী হইলাম ।

মায়ের মানা না শুইন্যা আমি কি ভুলকরিলাম।।

'মহীপালের গীত' পাঠেমনে হয় মহীপালের রাজত্বকালে এটি রচিত হয়নি। তাঁর মতদোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজার সমকালে এমন সাহসী প্রতিবেদন রচনা করাতখনকার কোন পালাকারের পক্ষে অকল্পনীয়। হয়তো তাঁর লাম্পট্যও অত্যাচারের কথা ঐ-সময় মানুষের মুখে-মুখে ঘুরে বেড়াত, যাপরবর্তীকালে গীতিরূপ লাভ করে।

দীঘি-পুষ্করিণী নিয়ে যেসব লোককথাবাংলার গাঁ-গঞ্জে আজও ছড়িয়ে আছে তার অধিকাংশই কিংবদন্তিমূলক।সাধারণ লোককথার বৈশিষ্ট্য যদি হয় গল্প শুনিয়ে শ্রোতার মনোরঞ্জন তবেকিংবদন্তির একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য তা শুধু গল্প শুনিয়েই তৃপ্তনয়, কথিত কাহিনীটি যে সত্যিই ঘটেছিল এই ধারণা শ্রোতার মনে সৃষ্টিকরাও তার দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। বক্তব্যটি খোলসা করে তুলতে এ-রকমএকটি কাহিনী এখন হাজির করি। এটি উত্তর চবিবশ পরগণার বেড়চাঁপা অঞ্চলেবহুল প্রচলিত। কাহিনীটির সঙ্গে দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতু সরাসরি এবংপরোক্ষভাবে পীরগোরাচাঁদ নামে এক মুসলমান ফকির জড়িত।গোরাচাঁদকে নিয়ে যেসব পাঁচালি আছে কিংবা স্বীকৃত ইতিহাস আছে, তাতেকিন্তু কাহিনীটি গৃহিত হয়নি। অর্থাৎ এটি একটি নির্ভেজাল শ্রুতিনির্ভরকাহিনী। কাহিনীর নায়ক রাজা চন্দ্রকেতু। প্রতিপক্ষ মুসলমান বাদশা।

রাজা যাচ্ছেন যুদ্ধে। যাবার আগেরানীকে বললেন, যুদ্ধে আমার জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। তবু বলা তো যায় না। যদিজিতে ফিরি তবে রণক্ষেত্র থেকে সাদা পায়রা পাঠিয়ে দেব, পরাজিত হলেআসবে 'কালো পায়রা'।

যুদ্ধে চন্দ্রকেতুই জিতেছিলেন । কিন্তু যুদ্ধজয়ের আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনিসাদা পায়রা না পাঠিয়ে পাঠিয়েছিলেন কালো পায়রা। এই ভুল সাংঘাতিক বিপর্যয় ডেকে এনেছিলতার সংসারে। সন্ধ্যার দিকে কালো পায়রাটি যখন রাজবাড়ির বাতায়নে এসেবসল তখন তাকে দেখে রানী তাঁর ইতিকর্তব্য সেরে ফেললেন। ছোট্ট ছেলেটিকেকোলে নিয়ে ঝাঁপ দিলেন দহের জলে। যবনদের কাছে ধরা দেওয়ার চেয়েআত্মহননের পথই তাঁর কাছে তখন শ্রেয় মনে হয়েছিল ।

ওদিকে, সুসজ্জিত হাতির পিঠেচেপে রাজা ফিরে এলেন একটু রাতের দিকে। সিংদরজার দিকে তাকিয়েতাঁর চোখে অপার বিস্ময়! জয়বার্তা পেয়ে রাজবাড়ি কোথায় আলোয়ঝলমল করে উঠবে , তা না, একী নিঝুম অন্ধকার। হাতির পিঠে বসে-থাকাঅবস্থাতেই তিনি মন্ত্রী মশাইকে হেঁকে বললেন, বাড়ি এমন অন্ধকার কেন?

মন্ত্রীমশাই কম্পিতকণ্ঠে জানালেন,রানীমা ছেলেকে নিয়ে দহের জলে'--

মন্ত্রীমশাই তাঁর কথা শেষ করারআগেই রাজা হাওদা থেকে নেমে, পাগলের মত ছুটলেন দহের দিকে।অন্ধকারপুষ্করিণীতে মৃতা রানী আর ছেলের ভেসে-ওঠা দেহ দেখে তিনিওআত্মহত্যা করলেন।

এ-কাহিনীর প্রতিধবনি শুনি মেদিনীপুরের নয়াগ্রামে। আশ্চর্যেরব্যাপার, সেখানেও রাজাটির নাম চন্দ্রকেতু এবং রাজ্যের নাম দেউলবাড়ি, আরপারাবত-বিভ্রাটে সলিল-সমাধি তো আছেই!

হুগলির শাহ সুফির মাজার-সন্নিহিতধবংসস্তুপটিরও স্থানীয় পরিচয় চন্দ্রকেতুগড় এবং সেখানেও রায়রাজাকেনিয়ে একই ধরনের পারাবত-বিভ্রাটের কাহিনী শোনা যায়। বনগাঁ-রানাঘাট লাইনে দেবগ্রামেও এই একইকাহিনী রকমফেরে শুনতে পাই। ওখানে রাজার নাম অবশ্য দেবপাল। যশোরেও এইএকই কাহিনী শোনা যায় বিজয়নগরে। সেখানে পারাবত-বিভ্রাটে রাজার দুইরানী ডোবেন যে পুকুরে তার নাম দুই সতীনের পুকুর আর কন্যারা ডোবেন যে পুকুরে তার নাম কন্যাদহ। ড. আশরাফ সিদ্দিকী তাঁর 'কিংবদন্তির বাংলা'-য়বংশাই নদীর তীরবর্তী রতনগঞ্জেররাজাকে নিয়েও একই কাহিনী শুনিয়েছেন। সাহিত্যিক মনোজ বসু তাঁর'বনমর্মর' উপন্যাসে এই পারাবত-বিভ্রাটের মোটিফটির এক অনবদ্যসাহিত্যরূপ দিয়েছেন। পারাবত-বিভ্রাটের কেন্দ্রীয় মোটিফটির নাম পবনদূত,ইউরোপে যা 'পিজিয়ন মেসেনজার' নামে পরিচিত । সাদা পায়রাআর কালো পায়রাকে নিয়ে এই কাহিনীটি বস্তুত একটি নির্ভেজাল লোককথা। লোককথারঅনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য হল দেশান্তরে পাড়িদেওয়া। কাহিনীতে সাদা আর কালো পায়রার বর্ণবৈশিষ্ট্য বিশেষভাবেলক্ষণীয়। সাদা শুভ তথা আনন্দের আর কালো অশুভ অর্থাৎ বিষাদেরপ্রতীক। সারা বিশ্বেই এ সম্বন্ধে লোকবিশ্বাস একই রকম।

পুষ্করিণীকে কেন্দ্র করে বিষাদঘনআর একটি কাহিনীও এখানে শোনাই। কাহিনীটি শোনা যায় যশোরের ঝিন

াইদহ ও তার সন্নিহিত অঞ্চলে।কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে রাজা মুকুট রায়ের নাম। মুকুটরায়ের রাজত্বকালে ঝিন াইদহে একবার ভয়াবহ খরা হয়েছিল। নদী-নালা-দীঘি-পুষ্করিণী সবই শুকিয়ে খা-খাকরছিল।

জলের জন্য প্রজাদের হাহাকারদেখে রাজা স্থির করলেন একটি বৃহৎ জলাশয় খনন করবেন। জলাশয় খননের ক াজ শেষ হলে প্রজাদেরজলকষ্ট অনেকটা দূর হবে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ। অনেক লোক মিলে দিন-রাত্র জেগে চলতে লাগলপুকুর খননের কাজ। তাল তাল মা টিকেটেও জলের হদিস মেলে না। প্রজারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। মেয়েরা কান্নাকাটি শু করে দেয়। শ্রমিকেরা হতাশ হয়ে পড়ে। রাজা পড়েন দাণ দুশ্চিন্তায়। প্রজাদের এই জলকষ্টদূর করতে না পারলে তাঁর শাসন চালানোই দুষ্কর হয়ে পড়বে।র াজ-জ্যোতিষীর নির্দেশে পুরোহিত ডেকে জলদেবতার পূজা অর্চনা শু হয়েগেল। তবু কিন্তু আকাশ থেকে বৃষ্টিঝরল না, খনন-করা পুকুর থেকেও উঠল না এক ফোঁটা জল। রাজামশাইয়ের রাতের ঘুম গেল। দিনেওরাজকার্যকরতে পারেন না প্রজাদের অবর্ণনীয় জলকষ্ট দেখে। চিন্তিত রাজামশাই এক রাতে জলাভাবজনিত সমস্যার কথা ভাবতে ভাবতে, কী আশ্চ র্য, জলদকণ্ঠে দেবতারস্বপ্নাদেশ পেলেন , রানী যদি জলাশয়ে এসে নিজে পূজো দেন তবেই জলউঠবে।

পরদিন সকালে রাজা স্বয়ংস্বপ্নাদেশের কথা রানীকে শোনালেন। রানী জানালেন, প্রজাদেরকল্যাণে জলাশয়ে গিয়ে পূজো দিতে তাঁর কোন আপত্তি নেই।

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটে গেল।শুভদিন দেখে রাজা জলাশয়ে রানীর পূজোর ব্যবস্থা করলেন।

হাজার হাজার প্রজা সেই বিশালজলাশয়ের পাড় ঘিরে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল। রাজ ারও কৌতূহলের শেষ নেই।

প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতেপট্টবস্ত্র পরিহিতা রানী ধীরে ধীরে নেমে গেলেন সেই গভীর জলাশয়ের মধ্যে।সেখানে রাজ াদেশে আগে থেকেইরাজপুরোহিত পূজায়োজন সেরে রেখেছিলেন। জলাশয়ের চারপাশ থেকেমেয়েরা শঙ্খধবনি দিল, উলুধবনি দিল। পাড়ে দাঁড়িয়ে পুরোহিত মশাইউচচকণ্ঠে মন্ত্রোচচারণ করলেন। রানীর পূজা শেষ হল। এবার তিনিউঠে জলাশয়ের গভীরে - আরও গভীরে নামতে লাগলেন। শান্ত চরণে যখন তিনি জলাশয়ের শেষস্তরে অবতরণ করলেন তখনই বিশাল জলাশয়ের একপ্রান্ত থেকেহু-হু করে জল উঠছে । বহুপ্রতীক্ষিত সেই জলরাশি দেখে রাজা আনন্দে বিহ্বল , প্রজারাও আনন্দেরআতিশয্যে ঢ্যাম কুড়াকুড় ঢোল বাজাতে লাগল। বেচারি রানীমার কথা কা মনেই পড়ল না !

হঠাৎই রাজা সম্বিৎ ফিরে পেলেন। ডুকরে কেঁদে উঠলেন রানীর নামধরে। প্রজারাও মূহুর্তে বাজনা বন্ধকরে দিল। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গিয়েছে। হরিষে বিষাদ নেমে এলনতুন খোঁড়া সেই জলাশয়ের চারপাশে।

ঝিনাইদহ-সন্নিহিত বাহান্ন বিঘা জমিরওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই জলাশয়ের নাম অতঃপর হল ঢোলসমুদ্র। ঢে ালসমুদ্রেরপাড়ে দাঁড়িয়ে আজও মনুষ অশ্রু-ভারাক্রান্ত চিত্তে স্মরণ করে রাজামুকুট রায়ের রানীকে, কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় প্রজাদরদী মুকুটরায়ের নামে।

এবার যাওয়া যাক রাঢ়বাংলায়। এখনযে জলাশয়ের কথা বলব তার সঙ্গেও মিশে আছে এক রাজপরিবারের অশ্রুসজল স্মৃতি। বিশিষ্ট পরিবারটি বিষ্ণুপুরেরমল্লরাজ পরিবার। কাহিনীটির মধ্যেজড়িয়ে আছে রানীর গঙ্গোদক নিয়ে ধর্মীয় সংস্কার, যৌবনমদমত্তা যবনকন্যারদেমাক, অনাচারী রাজার প্রতি রক্ষণশীলপ্রজাবৃন্দের তীব্র ঘৃণাইত্যাদি বিবিধ ম ানবিক বৈশিষ্ট্য। কাহিনীটি এরকমঃ

রাজা যাচ্ছেন যুদ্ধে। যাবার আগেরানীকে শুধান, যুদ্ধে জিতে তোমার জন্য কি নিয়ে আসব বল ?'

রানী প্রথমে চুপ করেই ছিলেন,কিন্তু রাজার পীড়াপীড়িতে তাঁকে শেষে বলতেই হয়, 'তুমি তোগঙ্গাতীরে যুদ্ধে য াচ্ছ, ফেরার সময় আমার জন্য বরং এক কলসি গঙ্গোদকএনো।'

রাজা যুদ্ধে জিতলেন। দেশেও ফিরলেন যথাসময়ে। রানী ভাবেন, এবার বুঝি রাজা অন্দরমহলেআসবেন তাঁর প্রার্থিত পবিত্র গঙ্গোদক নিয়ে। না, রাজা আদৌ অন্দরমহলে এলেননা। তার বদলে অন্দরমহলে এলেন রাজাদেশে এক যবনকন্যা। যুদ্ধে জিতে রাজা এনেছেনতাকে। যবনকন্যার অঙ্গুলনির্দেশেই নাকি এখন রাজা চলেন। তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞ াননাকি ঐ নারী। ওর নির্দেশেই রাজা নাকি চাইছেন রাজ্যের সমস্তপ্রজাকে বিধর্মী বানাতে। রাজার এই মনোভাব জেনে প্রজারা বিদ্রোহী।মন্ত্রীমশাই এসে রানীমাকে বলেন, আর তো চুপ করে বসে থাকা যায় না, যাহোক একটা কিছু বিহিত

কন।'

রাণীকে বিষেশ কিছু করতেই হলনা। একদিন রাজা যখন অলিন্দে সেই যবনকন্যার সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন তখনব াইরে থেকে এক বিষাক্ত তীর এসে বিঁধল রাজার বুকে। রাজা তৎক্ষণাৎমৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়লেন। তখন চারদিক থেকে ক্ষিপ্ত জনতা এসে সেই যবনকন্যাকে কেটেটুকরো টুকরো করে, সেই খণ্ডিত রক্তাক্ত দেহ ছুঁড়ে ফেলে দিলসম্মুখের বঁ াধে। যবনকন্যার দেহের রক্তে লাল হয়ে উঠল বাঁধের জল। ঐবাঁধটিকে লোকে বলে 'লালবাঁধ' আর সেই যবনকন্যাটিকে বলে লালবাঈ। লালবাঁধকে ঘিরে লালবাইয়ের সেই জনশ্রুতি শুনে এখনওপথিক-পর্যটকদের মন ভারাক্রান্ত হয়। এই যবনকন্যার প্রেমকথাঅমর করে রেখেছেন রমাপদ চৌধুরী তাঁর ' লালবাঈ' উপন্যাসে।

যে মল্লরাজের আমলে সেই শোকাবহঘটনাটি ঘটে তাঁর নাম দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। রাণীর নাম চন্দ্রপ্রভা।

বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর থেকেএবার চলুন মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে। এখানকার রাণীসাগর নামের সরোবরটিঘিরে যে কাহিনীটি শোনা যায় তাতেও দৈবাদেশ একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে এবংএখানেও রাণীই কাহিনীর মুখ্য চরিত্র। কা হিনীটি এ-রকম ঃ

দেবী ব্রহ্মাণী রাণী মধুমঞ্জরীকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেল,'আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত। আমার তৃষ্ণামোচনের জন্য এখুনি একটাবড় দীঘি খনন কর।'

ব্রহ্মাণীর স্বপ্নাদেশপেয়ে রাণী সত্বর তৈরী করলেন একটা বড় দীঘি । ব্রহ্মাণীর তৃষ্ণাতবুও মেটে না। তিনি ফের র াজপুরোহিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন,'রাণীর চোখের জল পড়বে যে- মাটিতে সেখানে কাটা পুকুরের জলইশুধু আমার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে।'

সদানন্দময়ী রাণীর কোন দুঃখই ছিলনা। দুঃখ ছাড়া কার আর চোখের জল পড়ে? রাজপুরোহিত পড়েন মহাফঁ াপরে। তিনি নিজেও তক্কে-তক্কে থাকেন,রাণীর পরিচারিকাদেরও বলেরাখেন, বিরলে বসে রাণী কখনো কাঁদেন কিনা দেখতে।

দিন যায়, মাস যায়, বছর ফুরায় ।রাণীমা কাঁদেন না,দেবী ব্রহ্মাণীর তৃষ্ণাও মেটে না।

শেষে একদিন অঘটন ঘটল। এক তাপদগ্ধদুপুরে গরমে হাঁপিয়ে উঠে রাণী মধুমঞ্জরী অলিন্দে এসেছিলেন একটু ব াতাসপাবার আশায়। বাইরে চোখ পড়তেই ঘটে গেল সেই বহুকাঙ্খিত অঘটন। রাণীদেখলেন দূর-দূরান্তর থেকে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা আসছে কলসিহাতে নিয়ে। রাজবাড়ির ইঁদারা থেকে তারা খাবার জল নেবে।

মধুমঞ্জরী অলিন্দ থেকে বাইরের বাগানে বেরিয়ে এসে ছেলেমেয়েদেরশুধালেন, 'তোমরা কোথা থেকে আসছ?'

ছেলেমেয়েরা বহু দূরবর্তী গ্রামেরনাম বলল। ছেলেমেয়েদের এই কষ্টের কথা শুনে রাণীর চোখ বেয়ে টসটসকরে জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

রাণী মধুমঞ্জরীর চোখের জল পড়ল যেখানে , সেখানেই আবার নতুন করেখননের কাজ শু হল। লোকের মুখে-মুখে এই নতুন সরোবরের নাম হল রাণীসাগর।'কিংবদন্তীর দেশে ' গ্রন্থে এ কাহিনীটি শুনিয়েছেনসুবোধকুমার ঘোষ।

মেদিনীপুর থেকে এবার আমরাবর্ধমান-মুখী হব। ক্ষীরগ্রামেরক্ষীরদীঘিই আপাতত আমাদের গন্তব্য। ক্ষীরগ্র ামের বর্তমান বসতি এলাকা থেকে ক্ষীরদীঘি বেশকিছুটা দূরবর্তী। যেখানে ধামাচ নামে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। সেই পুষ্করিণীতে আছে শাঁখারিঘাট নামেএকটি ঘাট।

সেই শাঁখারিঘাটে একদিন এক সুন্দরীযুবতী স্নান করছিল। পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক শাঁখারি 'শাঁক নেবে গে া'হেঁকে। শাঁখারিকে দেখে মেয়েটিরশাঁখা পরার সাধ জাগে। স্নান সেরেপাড়ে উঠে সে শাঁখারির কাছে শাঁখাও পরে। দ াম দেবার কালে সে বলে, যুগদ্যা মন্দিরের পূজারি আমার বাবা হন। তাঁর কাছে দাম চেয়ে নাও।'

শাঁখারি পূজারির কাছে গিয়েমেয়েকে দেওয়া শাঁখার দাম চায়। পূজারি অবাক। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলেন, 'আমারকোন মেয়ে নেই। তুমি যাকে শাঁখাপরিয়েছো তার পরিচয় আমার জানা নেই। আমি তোমাকে শাঁখার দাম দিই কি করে?

শাঁখারিটি খুবই গরিব। সে দাম পাবার জন্য পূজারিকে খুবইপীড়াপীড়ি করছিল। পূজারি তখননাছোড়বান্দা শাঁ াখারিকে বলে, 'কই চলতো সেই মেয়েটির কাছে'। এই সময় হঠাৎ-ই পূজারির নজরেপড়ল কুলঙ্গিতে পাঁচটি রূপোর ট

াকা।

যাইহোক, পূজারিকে নিয়েশাঁখারি তাড়াতাড়ি চলে এল সেই পুকুরপাড়ে যেখানে সে মেয়েটিকে শাঁখ াপরিয়েছিল। অবাক কাণ্ড ! অল্পসময়ের মধ্যে মেয়েটা গেল কোথায় ? তবে কি প্রতারকের পাল্লায় সেপড়ল? ভেউ ভেউ করে কাঁদতেলাগল শাঁখারি বেচারা। কাঁদতে-কাঁদতেই শাঁখারি দেখে পুকুরের মাঝামাঝি জায়গায়শাঁখা-পরা দুটি বাহু উঁচিয়ে আছে। শাঁখারি তখন পূজারিকে সেই দৃশ্য দেখায়। পূজারির আর বুঝতে বাকি থাকে নাশাঁখারি কাকে শাঁখ া পরিয়েছে। শাঁখারিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শাঁখার দাম আর চায় না ।

আজও ফি বছর বৈশাখী পূর্ণিমার দিনএই ঘটনার স্মরণে সন্নিহিত গ্রাম গোবর্ধনপুর থেকে মাসির বাড়ির ঝাঁপিন ামে শাঁখাসিন্দুর ও অন্যান্য উপহার দ্রব্য আসে মা যোগদ্যামন্দিরে। মন্দিরের কুলঙ্গিতে আজও সংরক্ষিত আছেসেই পাঁ াচটি রূপোর টাকাও।

এই একই কাহিনী শোনা যায়বাঁকুড়ার ছাতনায় বাশুলিদেবীকে ঘিরে। কবি চণ্ডীদাসের আরাধ্যা বাশুলি পদ্মদীঘির জলে নাকি হাত তুলেশাঁখা দেখিয়েছিলেন এক শাঁখারিকে। বিষ্ণুপুরের ভাগ্যবান সেই শাঁখারির বংশধরেরা এখনও বাশুলিপূজোর সপ্তমীর দিন ফিবছর দেবীকে পরানোর জন্য নতুন শাঁখা পাঠিয়েথাকে। বিহার-সীমান্তে বর্ধম ানেরমাইথনেও দেবী কল্যাণেশ্বরীকে ঘিরে একই কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়। বহরমপুরের অনতিদূরে বিষ্ণুপুরেরকালীকে ঘিরেও অনুরূপ কাহিনী শোনা যায় ।

দেবী ব্রহ্মাণীর স্বপ্নাদেশেপুষ্করিণী-খননের পেছনে যদিবা গরিব-মানুষের জলকষ্ট নিবারণমূলকসমাজসেবার গন্ধ পাওয়া যায়, শাঁখারির কাছ থেকে যোগদ্যা মায়ের শাঁখাপরার ইচ্ছায় সেসব কিছুই নেই, তবু দেবীমাহাত্ম্যের নিরিখে ভক্ত হিন্দুদেরকাছে দ্বিতীয় কাহিনীর জনপ্রিয়তাই সমধিক।

এবার পুকুর বা দীঘিকে ঘিরেশোনাই এমন কিছু কাহিনী যার সঙ্গে মুসলমান পীর-ফকিররা জড়িয়ে অ াছেন। অবশ্য অভিনিবেশ সহ অনুধাবনের চেষ্টা করলে সেসব কাহিনীতেও সমাজসেবার মনোভাব গোপন থাকে না এবংএটাও বোঝা যায় আদতে যা সর্বপ্রাণবাদী দীঘি দেবতা ছিল তা-ই এখানেপীর-ফকিরের নামাবলিগায়ে জড়িয়েছে।

স্থান বসিরহাট মহকুমারহিঙ্গলগঞ্জে সাভরন পীরের দরগা। দরগার পাশেই একটি বড় পুকুর । লোকেবলে পীরপুকুর। এই পুকুরেরবিশেষত্ব হল, গাঁয়ে কার বাড়িতে উৎসব-অনুষ্ঠান হলে, অনুষ্ঠানেরআগের দিন সন্ধ্যায় গৃহস্থ যদি শুচিশুদ্ধ মনে পুকুরপাড়ে এসে পীরের কাছেসাহায্য প্রার্থনা করে তবে পীরবাবা সেই গৃহস্থকে অনুষ্ঠানেপ্রয়োজনীয় হাঁ ড়িকুড়ি-থালাবাসন পুকুর থেকে সরবরাহ করেন । শর্ত থাকে, অনুষ্ঠানশেষে সেইহাঁড়িকুড়ি-থালাবাসন আবার পুকুরেই ঠিকঠিক ফেরৎ দিতে হবে।

একবার নাকি এক গৃহস্থ অশুচিঅবস্থায় পুকুরে এসে থালাবাসন প্রার্থনা করেন; তাইতে অসন্তুষ্ট হয়েপীরবাবা অ াগের মতন আর কাউকে থালা বাসন দেন না।

ঐ পুকুরে একবার এক মাতাল মদ খেয়ে মদের বোতলফেলেছিল। পীরবাবা তাতে এতই রেগেছিলেন যে ঐ পুকুরের জল যে পান করবেসে কলেরা রোগে প্রাণ হারাবে এই শাপ দেন। ঐ পুকুরের জল খেয়েএরপর সত্যিই অনেকে মারা যায়। গ্রামবাসীদেরঐ ভাবে মরতে দেখে গ্রামের সবাই মিলে পীরের মাজারের কাছে গিয়ে ঐ মাতালের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চায়। পীরবাবা নাকি তাতে প্রসন্ন হয়েনিজের দেওয়া শাপ প্রত্যাহার করে নেন।

হিঙ্গলগঞ্জের সাভরন পীর ছাড়াওহাড়োয়ার পীর গোরাচাঁদকে ঘিরেও এই ধরনের অজস্র কাহিনী শোনা যায়খ াসবালান্দা-ধনপোতা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণমানুষের মুখে।

জীয়ৎকুণ্ডু নামে আর এক ধরনেরজলাশয়ের কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়ে। যুদ্ধে আহত-নিহত সৈন্যরা নাকি জীয়ৎকুণ্ডের জলে স্নান করেসুস্থ হয়ে উঠত এবং পুনরায় যুদ্ধে অংশগ্রহণে সমর্থ হত। সিলেটে এই ধরনের এক জীয়ৎকুণ্ডের দৌলতেরাজা গৌরগোবিন্দ নাকি দেশের পরাক্রান্ত বাদশা সৈন্যকে প্রায়হারিয়েই দিয়েছিলেন। শেষে, শ াহজালালনামে এক ফকির রাজার ঐ জীয়ৎকুণ্ডের সন্ধান পান এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি নষ্ট করেন। তাতেই সিলেটে

মুসলমান বাদশা অতঃপরজয়লাভ করেন।

একই ধরনের কাহিনী শোনা যায় হুগলির পাণ্ডুয়া এবং মহানাদে। মহানাদের জীয়ৎকুণ্ডকে নিয়ে কাহিনীটিইবলা যাকঃ

মহানাদের হিন্দু রাজার সঙ্গে বারবারহেরে গিয়ে শাহসুফির সঙ্গীরা রাজপ্রাসাদের ভেতর গোপন জীয়ৎকুণ্ডেরসন্ধান পান। জীয়ৎকুণ্ডের সঞ্জীবনীশক্তিনাশ করার জন্য তাঁরা কাজিমন ফকিরের শরণ নেন। প্রথমদিকে, কা জিমন রাজার ঐ হিতকর ব্যবস্থাটিনষ্ট করতে অসম্মত হন, কিন্তু পরে নিজধর্মের মানুষদেরসম্মানরক্ষার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও রাজি হয়ে যান ।

কাজিমন হিন্দু সন্ন্যাসীর বেশেঅসুস্থ হওয়ার ভান করে রাজার কাছে গিয়ে জীয়ৎকুণ্ডে স্নান করারইচ্ছে জানান। রাজা প্রথমে রাজী হননা। কিন্তু সন্ন্যাসীকে সারাদিন রাজবাড়িতেহত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে দেখে সন্ধ্যাবেলা স্নান করার অনুমতি দেন। সন্ধ্যার আবছা আলোয় দ্বাররক্ষীলক্ষ্য করে সন্ন্যাসী জটা থেকে মাংসখণ্ডের মতো কী একটা বের করেজীয়ৎকুণ্ডের জলে নিক্ষেপ করলেন। হিন্দু সন্ন্যাসী কখনও পশ্চিমমুখো হয়ে স্নান করে না, অথচ এই সন্ন্যাসীটি তা-ইকরছেন। স্নান সেরে সন্ন্যাসী বশিষ্ঠগঙ্গার তীর ঘেঁষে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছেন। দ্বাররক্ষী তাড়াতাড়ি গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা রাজারগোচরে আনল। রাজাদেশে তৎক্ষণাৎভণ্ড সন্ন্যাসীর পিছু ধাওয়া করে তাঁকে ধরে আনা হল। তাঁর চুল ধরে টান মারতেই, পরচুলাখসে পড়ল। কাজিমন ফকির ধরা পড়ে স্বীকার করলেন যে গো-মাংসের খণ্ডফেলে জীয়ৎকুণ্ডের সঞ্জ ীবনী শক্তি তিনিনষ্ট করতে চেয়েছিলেন শাহ সুফির অনুরোধে। রাজাদেশে কাজিমনের মাথা কেটে ফেলা হল।

কাজিমনের কবর এখনও মহানাদে দেখতেপাওয়া যায়। সেই কবর দেখিয়ে স্থানীয় মানুষ আজও বহির াগতদেরজীয়ৎকুণ্ডের কাহিনী শোনায় ।

এবার যে-কাহিনীটি পাড়ব যা হিন্দুবা ইসলাম ধর্মের মত কোন শাস্ত্র-নির্ভর ধর্মের অনুষঙ্গে জারিত নয়, বরং ম ানুষের ধর্মচেতনারআদিস্তরে যখন মাঠঘাট-পাহাড়-পর্বত-গাছগাছালির মধ্যে যে ঈশ্বরেরঅস্তিত্ব খুঁজে পেত, সেই সর্বপ্রাণব াদী ধর্মচেতনাই তাতে ফুটেউঠেছে। দীঘি বা পুকুর এখানেনিজেই দেবতা হয়ে বসে আছে। স্বস্তির কথা, কাহিনীটিতে তত্ত্বকথার প্রভাব বিন্দুমাত্রপড়েনি। কাহিনীটি এবার শোনা যাক ঃ

এক দুঃখিনী বউ সংসারেস্বামী-শাশুড়ীর জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে দীঘিদেবতার কাছে এসে বলে, 'হেদীঘিদেবতা, আম াকে তুমি আশ্রয় দাও ।'

দীঘিদেবতা দুঃখিনী বউকে সাদরেবলেছিল, 'আয় মা, আমার কাছে আয়।'

দুঃখিনী বউ দীঘির জলে গেলে, দেবতাতাকে বলে, 'মা তুই এই দেহ নিয়ে আমার কাছে থাকলে,অল্পক্ষণের মধ্যে পচে-গলে যাবি। মাটি হলে, মিশে যাবি মাটির সঙ্গে। জল হলে, মিশে যাবি আমার সঙ্গে।'

দুঃখিনী বউ বলে, 'তোমার সঙ্গেইআমাকে মিশিয়ে নাও বাবা, আমি আর সংসারের জ্বালা সহ্য করতে পারছি ন া।

দুঃখিনী বউয়ের কথা শুনেদীঘিদেবতা তাকে বলে, 'না মা, তুই পাষাণী হয়ে আমার বুকেই বরংথাক। তরঙ্গে তরঙ্গে আমি তোকেআদর করব। মাছের সঙ্গে শেওলার সঙ্গেতুই খেলা করবি।'

গ্রীষ্মে খরার দিনে দীঘির জল শুকিয়েগেলে, বউডোবাপুকুরে আজও লম্বা একটা পাথর উঁকি মারে, এইপ াথরটিই হল দুঃখিনী বউ। দীঘিদেবতাতাকে ঐভাবে একখন্ড পাথর বানিয়ে রেখেছে। আজও পুকুরে বাতাসে ঢেউ উঠলে, দীঘিদেবতা তাকে তরঙ্গেতরঙ্গে সোহাগ জানায়। আজও চাঁদনিরাতেপুকুরের শেওলা-কুমুদদের সঙ্গে সেই দুঃখিনী বউ খেলা করে বেড়ায়। বউ ডোবাপুকুর-বৌঠাকুরানীর খালইত্যাদি নামে এক ধরনের জলাশয় দুই বাংলার অনেক গ্রামেই আছে। এ-বাংলার সুন্দরবন অঞ্চলে দুঃখিনী বউয়ের এইকাহিনীটি শুনেছি। বাংলাদেশেও অনেকদীঘিকে ঘিরে এ-ধরনের কাহিনী শুনতে পাই।

অনুরূপ কাহিনী শোনা যায়টাঙ্গাইলে কালীহাতির ভণ্ডের গ্রামের পোয়াতি বিলকে ঘিরে। অবশ্য সেখানে দীঘিদেবতা নয়, দীঘিদেবী দুর্গাইবিপদভঞ্জনা। জনশ্রুতি এই, জনৈকা কুলীনকন্যা সন্তানহীনতাহেতু শাশুড়ীরহাতে অবিরাম নির্যাতিতা হয়ে জীবনের জ্বালা মেটাবার জন্য ঐ বিলে মাঘীপূর্ণিমার দিনে ডুবে মরতে যায়। সেইসময় নাকি দেবী দুর্গা

এসে তাকে দেখা দিয়ে বলেন, বাছা, স্নান সেরে বাড়ি ফিরেযা, সন্তানবতী হবি।'

কুলীনকন্যা স্নান সেরে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল এবং কালক্রমে সন্তানবতীহয়েছিল। সেই থেকে মাঘী পূর্ণিমায় পোয়াতি বিলে স্নানোৎসব হয়ে আসছে। বিশেষত অপুত্রক নারীদের ঐ দিন ঐবিলেস্নানের জন্য রীতিমত হিড়িক লেগে যায়। 'লোকসাহিত্য' বইটিরদ্বিতীয় খণ্ডে আশরাফ সিদ্দিকী পোয়াতি বিলকে ঘিরে এই সর্বপ্রাণবাদীকাহিনীটি শুনিয়েছেন। বোঝাই যায়বিলদেবতারস্থলে মা দুর্গার আবির্ভাব এখানে নেহাতই প্রক্ষিপ্ত। দীঘিদেবতা বা বিলদেবতার কাহিনী শুধুবাংলাদেশেই নয়, বহির্বিশ্বের সর্বত্রই রকমফেরে শোনা যায়।

বাংলার দীঘি-পুষ্করিণীর কথাসম্পূর্ণ হবে না যদি না আমরা প্রতিবেশী আদিবাসীদের দীঘিকাহিনীর কথাবলি। বাঙালিরআচার-আচারণ-চিন্তা-ভাবনায় আদিবাসী সংস্কৃতির অবদান অপরিসীম। আদিবাসী জীবনেডাইন-ডাইনি-ভূত-প্রেত এবং ওঝা ইত্যাদির প্রভাব আজও বেশ সক্রিয়। সীমান্তবাংলার আদিবাসী-অধ্যুষিতঅঞ্চলের এক দীঘির কথা সবশেষে শোনাই। কাহিনীটি বরং ওদের মুখ থেকেই শোনা যাক, 'এই যে ধূ ধূবৃক্ষ ডাঙার মাঝে ওঝাদহ, এরে কেউ খোঁড়ে নাই গো। এক ডাইনি ঘাড়ে কর‍্যে দিঘি উইড়ে নেযাচ্ছিল। কাক ড্যেকছে বুলে ঝুমকইরে নামাংদিছে। সকালবেলায়গেরামের লোক উইঠ্যা দ্যাখে মাঠের মাঝে বিশাল দহ। গেরামে ছিল মস্ত ওঝা কালু। বড় গুনিন সে। সে বললে, দাঁড়াও ডাইনির দহ নিয়ে যাওয়া বন্ধ করছি। কেনে হব্যে মাঝ-ডাঙায় অমন বিশাল দীঘি? গ-ছাগলে জল খাবে? অত দূরে জল আইনতে গেমানুষের কষ্ট হবে না? বদমায়শিরআর জায়গা পায় নাই ডাইনি?

ব্যস, তারপর রাত্রে ডাইনি যেইদীঘিটা উড়াতে যাবে অমনি ওঝা ছাড়ল বাণ। সে কী কাণ্ড! এ মারে অগ্নিবাণতো ও মারে চক্রবাণ। শেষে ডাইনিরইহার হল। নাকখৎ দিতে হল তাকে সকলের সামনে। কান ধরে ওঠ-বস করতে হল তাকে একশোবার। সে জোড়হস্তে ওঝাকে বলল,'তুমারঅস্ত্রে আমি কাহিল হয়্যে গেছি ওঝা, দোহাই তুমার, আমারে আর বাণ মেরো না। দীঘি যেহানে ছিল সে সেহানেই থাক।'

সেই থেকে দীঘি আগের জায়গাতেইরয়ে গেল। আর তার নাম হয়ে গেলওঝাদীঘি (কাহিনীসূত্রঃ দীঘির গল্প হারিয়ে যাচ্ছে, অশোককুমার সেনগুপ্ত, পরিবর্তন ১৯৮০শারদসংখ্যা)।

ওঝার মন্ত্রগুণের মেয়াদ বোধহয়এখন শেষ হয়ে গেছে। তাইপ্রোমোটার নামক ডাইন-ডাইনীরা আবার মেতে উঠেছে পুরনোখেলায়। দীঘি-পুষ্করিণীগুলো তারাউড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কে জানে কোথায়? গ্রামবাংলা আজ সরোবরশূন্য হতে চলেছে। শহরতলির দীঘি-পুষ্করিণীগুলি এ -যুগের ডান-ডাইনীরা লোপাট করে দিচ্ছে। রাতারাতিসেখানে গজিয়ে উঠছে বিশাল বিশাল আকাশচুম্বী বহুতলবিশিষ্ট বাড়ি।

দীঘি-পুষ্করিণী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে,তাদের ঘিরে গড়ে ওঠা কাহিনী আর কতদিন টিকবে? এ-যুগের ডাইন-ডাইনীরা কেবলদীঘি-পুষ্করিণীই নয়, তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কাহিনীকেও ঐ ওঝা দহের মতউড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দু-একপ্রজন্মের পর দীঘি-পুষ্করিণী নিয়ে কাহিনী বলার জন্য কথক আরকেউ থাকবে না, শোনার জন্যও নয়।

পরিশিষ্ট

'দীঘি-পুষ্করিণী কথা'রকাহিনীগুলি আপাতদৃষ্টিতে আঞ্চলিক মনে হলেও, অন্তর্নিহিতমোটিফসমূহ কিন্তু এদের আঞ্চলিকতার আঁচল থেকে বার করেআন্তর্জাতিক পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। প্রখ্যাত মার্কিন লোককথাবিদ স্টিথটমসন(১৮৮৫-১৯৭৬) মোটিফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, মোটিফ হলকাহিনীর ক্ষুদ্রতম অংশ, ঐতিহ্যের মধ্যে যার বেঁচে থাকার ক্ষমতাথাকে। এই বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করতে হলে আংশিকউপাদানগুলির ভেতর অসাধারণ এবং আকর্ষণীয় কিছু থাকতে হবে (দ্যফোকটেল, পৃঃ৪১৫)।'

'দীঘি-পুষ্করিণী কথা'রঅবয়বে কাহিনী-অংশের মোটিফগুলি বন্ধনীর মধ্যে উল্লিখিত হলে মোটিফ-সনাক্তকরণ সহজ হত সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে অন্য ধরনের এক সমস্যাও তৈরি হত বৈকি। অর্ধশতাধিক মোটিফকে যদি তাদের লক্ষণ-বর্ণনা সমেত কাহিনী-অংশের পাশেবন্ধনীযুক্ত করে ঢুকিয়ে দেওয়া হত তবে কাহিনী-পাঠের মজাটা কি আরথাকত?

ভেবেচিন্তে, তাই এক্ষেত্রে অন্য একটি পন্থা অবলম্বনকরেছি, যাতে সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙে। লে

াককথার মোটিফ নিয়ে যাঁরা সত্যিকার আগ্রহী তাঁরা এইনতুন ব্যবস্থায় লক্ষণ -বর্ণনাসহ মোটিফসূচি পাঠ করেই আশা করিবুঝে নিতে পারবেন কাহিনী-অংশের কোথায় কোথায় কোন্-কোন্ মোটিফপ্রযোজ্য। যাঁরা শুধু গল্পেররসেই মজে থাকতে চান, তাঁরা না হয় পরিশিষ্ট' অংশ বাদ দিয়েইপড়বেন।

নীচে বর্ণ ও সংখ্যানুক্রমে'কিংবদন্তীর দীঘি-পুষ্করিণী-'র অন্তর্গত মোটিফসূচিদেওয়া হল ঃ

এ
ব্রাহ্মণদেবতার অংশ — এ ১৯৯.৩
জলেরদেবতা — এ ৪২০
নদীরদেবতা — এ ৪২৫
নদীরদেবী — এ ৪২৫.১
গ্রাম্য দেবী — এ ৪৩৩.১
কলেরারদেবী— এ ৪৭৮.৩
দুর্ভাগ্যেরদেবী— এ ৪৮২.১
সৌভাগ্যেরদেবী— এ ৪৮২.২
ষষ্ঠীরদেবী— এ ৪৮৯.১
পাপেরজন্য মহামারী— এ ১০০৩

বি
পারাবতদূত — বি ২৯১.১.১২
পশুমানুষকে বহন করে— বি ৫৫৬
পশুমানুষের জন্য কাজ করে— বি ৫৭১

সি
খাদ্যভক্ষণেবিধিনিষেধ— সি ২২০
বিশেষপানীয় পান — সি ২৭০
আরাধনা—সি ৪০২
উৎসব—সি ৪৩৬
নিষিদ্ধদিকেযাত্রা — সি ৬১৪.১
বিধি-নিষেধভঙ্গে শাস্তি— সি ৯২০
দেবরোষেমৃত্যু— সি ৯২১
দেবরোষেঅসুস্থতা— সি ৯৪০

ডি
মানুষ থেকে পাথরের স্তম্ভ —ডি ২০১.২
মন্ত্রেরূপান্তর —ডি ৫২২
ঐন্দ্রজালিকশক্তিসম্পন্ন বস্তু—ডি ৮০০
যাদুবর্ণ—ডি১২৯৩
যাদুকর—ডি১৭১১
পীরেরযাদুশক্তি—ডি১৭১২

ই
জীবনজল—ই৮০
পীরেরকৃপায় জীবনপ্রাপ্তি—ই১২১.৫
এফ
দীঘিকর্তৃক বাসনদান —এফ ৩৬২.২
জিনেরহাওলায় দীঘি—এফ৪৯৪.১২
পরমাসুন্দীরকন্যা —এফ৫৭৫.১
লালদীঘি—এফ৭১৫.৯
অস্বাভাবিকঘটনা —এফ ৯০০
জি
জিন—জি ৩০৭
জে
দেবতাস্বপ্নে উপদেশ দেন — জে ১৫৭.০.১
কে
ছদ্মবেশেছলনা — কে ১৮০০
সন্ন্যাসীরছদ্মবেশ — কে ১৮২৬.২
বিশ্বাসঘাতকব্যক্তি — কে ২২৬৫
এম
ভাগ্যলিপি— এম৩০২.২.১
অভিশাপেরক্ষতি — এম ৪০০
পীরেরঅভিশাপ —এম ৪১১.৮
এন
নিষ্ঠুরনিয়তি —এন ১০১
লক্ষ্মীছাড়লে দুর্দৈব —এন ১৩৪.১.৪
ঐশ্বর্যেরজন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা—এন ৫৫৪
অলৌকিকসাহায্যকারী দেবতা - এন ৮১০
অলৌকিকসাহায্যকারী দেবী —এন ৮১৭
পি
পুরস্কারস্বরূপরাজার স্ত্রীকে দান — পি ১৪.১.৩
রাজাকর্তৃক প্রজার স্ত্রীকে উপহারস্বরূপ পাওয়া — পি ১৫.২
জ্যোতিষী—বি৪৮১
সানানেরসময় নারীর সঙ্গে দেখা — পি ৬১১
কিউ
ধর্মীয়আত্মত্যাগে পুস্কার —কিউ২১
পাপীরশাস্তি —কিউ ২১০
দেব-অবহেলায়শাস্তি—কিউ২২৩
অহংকারেরশাস্তি —কিউ ৩৩১
টুকরোটুকরো করে কাটা — কিউ ৪২৯.৩
শাস্তিঃ খরা — কিউ৫৫২

আর
রাক্ষসদ্বারাঅপহরণ — আর ১১
যাদুকরদ্বারা অপহরণ —আর ৩৯.১
উদ্ধার— আর ১০০
এস
নিষ্ঠুরশাশুড়ি —এস ৫১
দীঘিতেজল ওঠার জন্য রানীকে জলদেবীর কাছে দান —এস ২৬৩.৩
টি
প্রথমদর্শনে প্রেম —টি ১৫
স্বামীরবহু বিবাহ —টি ১৪৫
সতীনেরপ্রতি হিংসা — টি ২৫৭.২
স্নানেরদ্বারা গর্ভবতী হওয়া — টি ৫২৩
ভি
দেবমন্দিরেগমন— ভি ১১০
পীরেরঅসাধ্য সাধন — ভি ২২৯.১০.২
সাধনালব্ধশক্তি অসৎ সাধু ব্যবহার করে — ভি ৪৬২.১.৩
ডব্লিউ
দয়ালুরাজা — ডব্লিউ ১১.২

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com